জিন্দাবাহার ও অন্যান্য

পরিতোষ সেন

পুনশ্চ

বিষয়সূচী

- ❑ জিন্দাবাহার ১৫—১৩৮
  - ❖ দর্জি হাফিজ মিঞা ১৫
  - ❖ সিন্-পেন্টার জিতেন গোঁসাই ২৯
  - ❖ ডেন্টিস্ট আখ্তার মিঞা ৪১
  - ❖ প্রসন্নকুমার ৫৫
  - ❖ আমি ৬৯
  - ❖ আগুন ৮৫
  - ❖ ন'বাবু, সেজোবাবু ৯৯
  - ❖ হে অর্জুন ১১৫
  - ❖ জামিলার মা ১৩১
- ❑ অন্যান্যরচনা ১৩৯—২২৪
  - ❖ এনায়েত খাঁর মৃত্যু অথবা একটি মহান শিল্পকর্মের জন্ম ১৪৩
  - ❖ কিষাণগড়ের রাধা ১৫৯
  - ❖ ভ্যান্ গখের চেয়ার ১৭৭

নিবেদন

জিন্দাবাহার

বছর দুই-আড়াই আগেকার কথা। গ্রীষ্মের এক মধ্যাহ্নে, লিটল্ ম্যাগাজিন 'কবিপত্র'র সম্পাদক শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায় এবং শিল্প-সমালোচক শ্রীসন্দীপ সরকার একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে হাজির হলেন। অনুরোধটি ছিল যে, এই পত্রিকার জন্যে আমার বাল্য-আলেখ্য লিখে দিতে হবে। লিখতে ব'সে, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে, স্মৃতিসৌধের অন্ধকার কোঠায় আবদ্ধ, ছোটোবেলাকার নানা কথা, নানা লোকজন, নানা অনুভব, এক অজানা সঞ্জীবনীর প্রক্রিয়ায় জীবাশ্ম পদার্থের নতুন প্রাণ পাওয়ার মতো, মিছিল ক'রে বেরিয়ে এল। প্রচলিত অর্থে স্মৃতিকথা লেখার প্রয়াসে ব্যর্থ হলাম। সাহিত্যিক ভানশীলতায় দুষ্ট হওয়ায় সেই লেখনী বাতিল ক'রে দিতে হ'ল।

ছবি আঁকাই আমার অনেক দিনের পেশা; লেখা নয়। ছবি আঁকার ফাঁকে-ফাঁকে পোর্ট্রেট, এমন-কি একই চিত্রপটে একটি গোটা পরিবারের প্রতিকৃতি আঁকায় আমি বরাবরই বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তাই মনে হ'ল শব্দ দিয়ে প্রতিকৃতি রচনা করলে কেমন হয়! এই বইটি সেই প্রয়াসেরই ফল। দু-একটি রচনা তৈরি হবার পর সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), শান্তি চৌধুরী, সুরজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ নিকট-বন্ধুদের পড়তে দিই। তাঁদের সকলের কাছে একইসঙ্গে সমাদর, সমালোচনা এবং উৎসাহ পেয়ে, একের পর এক প্রতিকৃতি "এঁকে" যাই। সম্পাদনার কাজে নিখিল সরকার মশাইয়ের সাহায্যও পেয়েছি উদারভাবে। তাঁদের সকলের কাছেই আমি নানাভাবে ঋণী। বন্ধুবর এবং সহকর্মী শ্রীদীপঙ্কর সেনের অকৃপণ সাহায্যের জন্য আমি নানাভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ।

যে নয়টি লেখা এই বইতে স্থান পেয়েছে, তার প্রত্যেকটিই 'এক্ষণ', 'অমৃত' এবং 'কৃত্তিবাস'-এ গত এক-দেড় বছরে, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বইটির 'জিন্দাবাহার' নামের সংক্ষেপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। ঢাকার নবাববাড়ির ঠিক পুব, পশ্চিম ও উত্তরের এলাকা-ক'টিই ছিল শহরের প্রকৃত স্নায়ুকেন্দ্র। উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে অনেকগুলো সরু পথ এই কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে। শহরের সবচাইতে বর্ণাঢ্য এলাকাও এইটিই। যেমন বিচিত্র এখানকার

বাসিন্দারা, তেমনই বিচিত্র এ-সব গলিঘুঁচির নাম—"জুমরাইল লেন", "আশক্ লেন" (ফারসি ইশক থেকে কি?), "জিন্দাবাহার লেন", আরো কত-কী! এই জিন্দাবাহার লেনেই আমার জন্ম। ষোলো বছর অবধি একটানা এই এলাকায় আমার জীবন কাটে। উর্দু "জিন্দেগী" (জীবন) থেকে "জিন্দা" (জীবন্ত, তাজা)। তার সঙ্গে "বাহার" ("বসন্ত") জুড়ে একটি অসাধারণ নামের সৃষ্টি। অর্থাৎ, "তাজা বসন্ত"। এই নামের স্রষ্টা যিনিই হোন-না কেন, তিনি যে নিতান্ত রসিক ছিলেন তাতে আর সন্দেহ কী!

এই গলিটি একটি বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধ ছিল। সে-কথা অন্যত্র বলেছি। শহরের গরীব আমীর অনেক বাসিন্দাই তাঁদের জীবনকে "তাজা" রাখবার উদ্দেশ্যে জিন্দাবাহার লেনে আনাগোনা করতেন। তার চাইতেও বড়ো কথা, নামটি "জীবন" সম্পৃক্ত এবং শাব্দিক ধ্বনিতেও সমৃদ্ধ। "জিন্দাবাহার" নাম রাখার পক্ষে এই কি যথেষ্ট নয়?

অন্যান্য রচনা

প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর জীবনে, কোনো না কোনো মুহূর্তে এমন সব মহান শিল্পকর্মের মুখোমুখি হয়েছেন যা দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন, যা তাঁর শিল্প-চেতনায় বিশেষ তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এমন কি তাঁর আপন শিল্পীসত্তার স্বল্পতা সম্বন্ধেও নানা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে।

আমার জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করি। যেমন Cimabue অঙ্কিত 'Madonna and the child', El Greco অঙ্কিত 'The Death of Count Orgaz', Michael Angelo খোদিত 'Moses'। Rembrandt-এর 'Portrait of a Lawyer', Cezanne-এর 'Portrait of Madame Cezanne', Monet-এর (লেনিনগ্রাদের আর্মিতাজ চিত্রশালায় রক্ষিত) দুটি অসাধারণ দৃশ্যচিত্র এবং (সেখানেই দেখা) Matisse-এর 'The Dancers'। এছাড়া, Picasso অঙ্কিত 'Guernica', Woman before the Mirror', 'The three Musicians' এবং আরও অনেক ছবি যার সম্পূর্ণ তালিকার উল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। এসব ছবি আমাকে এমনই মোহিত করেছিল যে তাদের সামনে আমি আক্ষরিক ভাবে জমে গিয়েছিলাম। মানুষের সৃজনীশক্তি যে ঈশ্বরের চাইতে কম বিস্ময়কর নয়, তার পরিচয় স্বদেশ এবং বিদেশের শিল্পসম্ভারে বহুবার পেয়েছি। এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাটি আমার জীবনকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং এর প্রকৃত মূল্যায়ন করায় আমি অসমর্থ।

শিল্পীদের জীবন নিয়ে গল্প কিংবা উপন্যাস (স্বল্প হলেও) রচনার কথা আমরা জানি। এগুলিতে শিল্পীর জীবনের রোমান্টিক দিকটিই হয়ে উঠেছে মুখ্য। তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মপদ্ধতি এবং যথাযথ বিশ্লেষণ ইত্যাদি হয়ে উঠেছে গৌণ। আমার ধারণায় আমি এদিক থেকে একটি ভারসাম্য আনতে পেরেছি। পক্ষান্তরে,

কোনো একটি বিশেষ চিত্র নিয়ে গল্প ফাঁদার কথা, অন্তত আমার জানা নেই। আর কিছু না হোক, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইয়ের তিনটি রচনাই খানিকটা মৌলিক বললে অন্যায্য হবে না।

প্রথম দুটি রচনায় আমি সুচিন্তিতভাবেই সাধুভাষা ব্যবহার করেছি। কারণ এ দুটির কাল প্রায় তিন-চারশ বছর পূর্বের। অপেক্ষাকৃত ভাবে তৃতীয়টি প্রায় এ যুগেই বলা যায়। তাই তৃতীয়টির ক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রয়োগ। বইয়ের কাল-উপযোগী নামকরণ করেছেন বন্ধুবর রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

পূর্বোক্ত মাস্টারপিসসমূহের তালিকায় এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত তিনটির উল্লেখ নেই। অথচ এ তিনটি আমি বেছে নিয়েছি কেন। তার কারণ দুটি—প্রথমত আমার দৃষ্টিতে এ তিনটি ছবিই তাদের নিজ নিজ গুণে মহান। দ্বিতীয়ত এ তিনটি চিত্র এবং চিত্রকর সম্বন্ধে গল্প বানাবার মতো মোটামুটি রসদ যোগাড় করতে পেরেছি। এ রচনা ক'টি অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক হলেও, আসলে এগুলো গল্প। আমি আশা করি যে, পাঠকেরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই এর সার্থকতা বিচার করবেন।

কলকাতা

পরিতোষ সেন

দর্জি হাফিজ মিঞা

ঢাকা শহরে আমাদের বাড়ি ছিল মুসলমান-প্রধান পাড়ায়। তাদের সঙ্গে আমাদের রেশিও ছিল প্রায় থি-ইজ-টু-ওয়ান। দু-চার ঘর পেশাদারী মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার ছাড়া, এ সম্প্রদায়ের বাকি সবাই-ই নানারকম স্বল্প আয়ের ছোটোখাটো দোকানদার ছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী হতে চলল তাদের দেখিনি। তবুও তাদের কথা বাদ দিয়ে আজও কেন জানি, ঢাকার কথা ভাবতে পারি না। শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতিপটের অর্ধেকের বেশিরভাগটাই জুড়ে আছে এরা। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং বৈচিত্র্যে এরা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চেহারাও ছিল তেমনি মজাদার— একেবারে সুকুমার রায়ের ছড়া এবং গল্পের উপযুক্ত সব নায়ক।

খিটখিটে মেজাজের দর্জি হাফিজ মিঞা। নিশুতি রাতের ডাকাতের মতো দেখতে, পনির-আখ্‌রোট-বাদাম-পেস্তার দোকানদার জব্বার মিঞা। দিবারাত্র মদের নেশায় মশ্‌গুল, ঘোড়াগাড়ির আস্তাবলের মালিক মির্জা সাহেব। কুচ্‌কুচে কালো, বিশালাকার এবং লোমশ হাতুড়ে ডেন্টিস্ট আখ্‌তার মিঞা। বিরাট পাকা তরমুজের মতো ভুঁড়িওয়ালা ফলবিক্রেতা আস্‌গর মিঞা। সদ্য-মাজা, রোদে-রাখা, পেতলের ডেক্‌চির মতো চক্‌চকে টাকওয়ালা তামাকবিক্রেতা কাল্লু মিঞা। সরু গোঁফওয়ালা রেস্টুরেন্ট-মালিক করিম খানসামা। আর ছিল ওস্তাদ বাজিকর ঝুল্লুর মিঞা। কচ্ছপের মতো তাকে আস্তে-আস্তে, পা একগজ ফাঁক ক'রে হাঁটতে দেখে মনে হ'ত সে যেন নিজেকে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেন দু-পায়ের মাঝে একটা অদৃশ্য বোঝা তাকে বইতে হচ্ছে।

আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে, দশ হাতের মধ্যেই, হাফিজ মিঞার দর্জির দোকান। আসন ক'রে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে মিঞা কাঁচি হাতে যখন কোটের ছাঁট দিতে বসত তখন দেখে মনে হ'ত ঠিক যেন দীর্ঘদিন অনশনরত, ধ্যানমগ্ন, অস্থিচর্মসার, স্লেটপাথরে খোদিত, গান্ধার শৈলীর অবিকল বুদ্ধমূর্তি। বুকের পাঁজরের খাঁচাটা যেন তার তিন জ' পেরেকের মতো সরু শরীরটা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। খাঁচার তলায় পেটের গর্তটি যেন অবিকল একটি আড়াই-সেরি দই-এর খালি ভাঁড়। শুধু উষ্ণীষের পরিবর্তে পচা পাটের রঙের কদমছাঁট চুল। আর ঐ রঙের আবছা যে গোঁফজোড়া ছিল, পরিচিত নানারকম মুসলমানী গোঁফের আকারের সঙ্গে তার কোনোরকম মিলই ছিল না। বলা বাহুল্য, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তার মিল এইখানেই শেষ। পেটের যাবতীয় রোগে ভুগে-ভুগে তার এমনই দশা হয়েছিল যে যা-ই খায়-

না কেন তার লিভার ঘোরতর বিদ্রোহ ঘোষণা করত। তবুও পিচগোলা জলের মতো দেখতে ভীষণ কড়া চা, আর আবির জলের মতো লাল, তেল-লঙ্কার রগরগে ঝোলওয়ালা, 'কালেজা-কা সালন্', ঘি-চপচপে পরোটার সঙ্গে না খেতে পেলে তার মেজাজ তক্ষুনি সপ্তমে চ'ড়ে যেত। এ-রকম সময়ে আমরা অনেক দূর থেকে তার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারতাম এই গোলমাল কিসের। পেটের রোগের সঙ্গে ক্রনিক সর্দি-কাশি থাকার দরুন তার গলা দিয়ে দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ বেরুত। সকালবেলার গুরুগম্ভীর খরজের ভাঙা স্বর, রোদের উত্তাপ বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। দিনের আলোর সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক না-থাকলেও সন্ধের দিকে সে-স্বর যদিও-বা কিঞ্চিৎ নামত, মাঝে-মাঝে কারণ-বিশেষে বেশ তীব্র হয়ে উঠতে একটুকুও দেরি হ'ত না। আর রেগে গেলে তো কথাই নেই। স্বরগ্রামের প্রত্যেকটি স্বরই তার গলা দিয়ে এমন জোরালো হয়ে বেরুত, হঠাৎ শুনলে মনে হয় যেন তখনকার দিনের চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগির কিঙ্কর সিং, আর ততই বিখ্যাত বাঘ-লড়াকু শ্যামাকান্ত ঝগড়া করছে। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম, 'পাঁপড়-তোড়-পালোয়ান'। অর্থাৎ তার গায়ে এত তাগত্ যে অনায়াসেই সে একটি পাঁপড় ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে পারে।

মিঞার খাবার আসত ইসলামপুর কিংবা বাবুরবাজারের একেক দিন একেক দোকান থেকে। বারো-তেরো বছরের অত্যন্ত গরিব একটি ছেলে, যেমনই নিকষ কালো তার গায়ের রঙ তেমনই মানানসই ছিল তার নাম। মাথায় তেলমালিশ, গা-টেপা থেকে পানবিড়ি আনা, এমন-কি প্রাতঃকৃত্যাদি সারবার সময় জল ভ'রে বদ্না এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় ফাইফরমাশ খাটত এই কাল্লুই। একধরনের বিহারী উর্দু এবং কুট্টি ভাষার এক আজব সংমিশ্রণে এদের মধ্যে কথাবার্তা চলত। হুকুম দেওয়া এবং সে-হুকুম যথার্থ তামিল হওয়ার ব্যাপারে মিঞার ভাবখানা ছিল দিল্লীর বাদশাহের মতো। হাজার হোক ঢাকার নবাববাড়ি তো কয়েক গজের মধ্যেই ছিল। তাছাড়া খোদ নবাবসাহেবের না-হলেও 'ডজন-ডজন ভাঞ্জা-ভাতিজা'র জামাকাপড় তো সে-ই তৈরি ক'রে দিত। তাই একটু-আধটু নবাবী চাল হ'লই-বা, তাতে দোষের কী! যেদিন কাল্লু এসে খবর দিত যে 'আজ কালেজা-কা সালন্ খতম হো গাইস্', সেদিন মিঞার মেজাজের কোনো ঠিকঠিকানা থাকত না। যেন পৃথিবীর সব খাবারের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মিঞা তা হলে খাবে কী! কাল্লু তাতে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে 'সালন্ নাহি হ্যাঁয় তো কেয়া হুইস্? বিরিয়ানি হ্যাঁইস্, শিক আউর শামী কবাব্ হ্যাঁইস্, চাপ্ হ্যাঁইস, মাটান চপ্ আউর কাট্‌লিস হ্যাঁইস, মাটান কারি আউর কিমা হ্যাঁইস্'—কে শোনে! এ-সব মিঞার একটাও পছন্দ নয়। তার 'কালেজা-কা-সালন্' চাই-ই; কাল্লুকে হাতপাখার ডাঁট্ দেখিয়ে বলে, 'নাহিতো তেরা পিঠ্‌কা চামড়া উখার দেগা।' ভয়ে কাল্লু ক্যারার মতো কুঁকড়ে যায়। উপায় নেই। ঐ সালন্ যে তাকে যেমন ক'রে হোক জোগাড় করতেই হবে। প্রয়োজন হলে রাত-বেরাতে বাড়ি গিয়ে তার মাকে

দিয়েই বানিয়ে আনতে হবে। তা না হলে তার আর রক্ষে নেই। যাই হোক, বেশিরভাগ দিনই কাল্লু তার মনিবের এই প্রিয় খাদ্যটি এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে, কোথাও-না-কোথাও থেকে ঠিক এনে হাজির করত। এ-রকম সময়ে মিঞার ঠোঁটের কোণে একটি অস্পষ্ট হাসির রেখা মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায়; যাতে কাল্লুর চোখে তা ধরা না পড়ে, পাছে যদি কাল্লুর সেবায় কোনোরকম ঘাটতি দেখা দেয়! ক্বচিৎ-কদাচিৎ যেদিন সে এ বিশেষ খাবারটি হাজির করতে পারত না, সেদিন সত্যি-সত্যিই তার পিঠের চামড়ার দফারফা হ'ত। ঐ দৃশ্য দেখে মিঞার ওপর আমার রাগের সীমা থাকত না। মানুষ কি এমন জানোয়ার হতে পারে যে তার বুদ্ধি-বিবেচনা সব লোপ পায়? এই বুড়ো বয়সেও লোকটার সংযমের কোনো বালাই নেই কেন!

মিঞার দপ্ ক'রে জ্বলে-ওঠা আগুনের মতো এই মেজাজ এবং নবাবী চালের পেছনে ছিল একদিকে তার অসুস্থতা আর স্ত্রী-বিয়োগ এবং নিঃসঙ্গতা বোধ, অন্য দিকে ছিল তার কারিগরিতে অসাধারণ মুন্সিয়ানা, আর তেমনই গর্ব। অতি উঁচুদরের কারিগরি শুধু দর্জিগিরিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পায়রা-ওড়ানো এবং বিভিন্ন জাতের গেরোবাজের বীজ মিশিয়ে উঁচু জাতের পায়রার বংশ তৈরি করাতে সে ছিল ততোধিক পারদর্শী। সে-কথায় পরে আসছি। নবাবী আমলে 'ওস্তাদ' খেতাবটি হয়তো এমন লোকের জন্যেই রাখা থাকত।

একদিন বিকেলে দোতলার রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় ত্রিপলের হুড্-দেওয়া একটি ফোর্ড গাড়ি এসে হাফিজ মিঞার দোকানের সামনে দাঁড়াল। সেকালে সারাদিনে বড়জোর একখানা কি দু'খানা মোটরগাড়ি আমাদের জিন্দাবাহার গলি দিয়ে যাতায়াত করত। হুডের তলার সওয়ারকে দেখবার জন্যে আমি বিশেষ কৌতূহলী। হাফিজ মিঞা শুয়ে ছিল। 'আস্-সেলাম্ ওয়ালেকুম্' ব'লে ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টকটকে লাল তুর্কি টুপি মাথায়, বিশুদ্ধ গাওয়া-ঘি রঙের রেশমী আচকান পরা, গৌরকান্তি একটি যুবক এক টুকরো পশমী কাপড় হাতে, গাড়িটা থেকে নামলেন। হাল্কা বাদামী রঙের দাড়ি-গোঁফ থাকা সত্ত্বেও যুবকের মুখাবয়ব কিঞ্চিৎ মেয়েলি। দর্জিকে কাপড়টা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'হামারা কোট্ বনা দিজিয়েগা।' পৈটিক গোলযোগের সঙ্গে বুকে শ্লেষ্মার আধিক্য মিঞাকে মাঝে-মাঝে ভীষণ কাবু ক'রে ফেলত। গভীর রাত্রিতে খ্যাকর-খ্যাকর কাশির আওয়াজে প্রায়ই আমার ঘুম ভেঙে যেত। এদিনও তার তবিয়ৎ এবং মেজাজ যে তেমন ভালো ছিল না, সকালবেলা থেকে কাল্লুর ওপর তার জুলুমের রকম দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। মিঞা খুব সরু গলায় এবং তমিজের সঙ্গে উত্তর দিয়ে বলল, 'মেহেরবানি করকে কাপড়া ছোড় যাইয়ে, আউর তিনরোজ বাদ আকে ট্রায়েল দে যাইয়েগা।' শুনে নবাবজাদার মাথার লাল তুর্কি টুপিটা প'ড়ে যায় আর কি! বললেন, 'লেকিন, লেকিন, আপতো হমারা নাপ্হি নহি লিয়া, ট্রায়েল ক্যায়সে হোগা!' মিঞা আগের মতোই চাপা সুরে যা বলল তার অর্থ, আপনি তিনদিন পরে আসুন

তো তার পর দেখা যাবে। নবাবজাদা, কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়তো ভাবছিলেন মিঞা কি নিছক ইয়ার্কি করছে! তার পর, কিছু না ব'লেই গাড়িতে ঢুকে পড়লেন। দর্জির আওয়াজ ক্ষীণ হলেও প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়, দীর্ঘজীবনের কারিগরির অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের যোগফল যেন। তবুও মিঞার কথা বলার ঢং-ঢাং দেখে মনে হ'ল ওর তবিয়ৎ তেমন বহাল নেই ব'লে নবাবজাদাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে চাইছে।

পরের দিন ভোরে উঠেই দেখি হাফিজ মিঞা কোটের কাপড় মেজেতে পেতে ওস্তাদ চিত্রকরের মতো, চ্যাপটা নীল চক দিয়ে, কোথাও সরল, কোথাও বক্র, অতি মার্জিত সব রেখা টানছে। মাঝে-মাঝে চোখ বুজে গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছে। নবাবজাদার শরীরের গঠন এবং আকৃতি অনুমান করার চেষ্টা করছিল কি? তপ্‌সে মাছের মতো সরু, লম্বা আঙুলগুলো এবং নীল চক ধরবার এবং তা দিয়ে টান-টুন দেবার কায়দা দেখে আমার মতো অপরিণত বয়সের বালকের চোখেও তাক লেগে যাচ্ছিল। আবার কয়েক মিনিট পর-পরই উঠে দাঁড়িয়ে এক চোখ বুজে দেখছিল চকের দাগগুলো ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক আয়তনে পড়ছে কি না! আমি অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি মিঞা দর্জি না আর্টিস্ট! তার পর অতি সন্তর্পণে নীল দাগগুলোর ওপর দিয়ে কাঁচি চালাল। আমি তার দুঃসাহস দেখে হতভম্ব। যদি ভুলচুক্ ক'রে বসে? যদি আস্তিন ছোটো হয়ে যায়? যদি পিঠের ওপর খোঁচ পড়ে? এবং তার ফলাফল কী হতে পারে এ-কথা ভেবে আমার মনে নানারকম আশঙ্কা ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করল। বিলকুল্ কোনো মাপ না নিয়ে লোকটা কোট বানিয়ে দেবে এবং সেটা নবাবজাদার মতো বিশিষ্ট একজন গ্রাহক বিনা প্রতিবাদে মজুরি দিয়ে গ্রহণ করবে? প্রত্যেক জুম্মাবারে মোল্লা ডেকে দোকানে 'মিলাদ্-শরীফ' ক'রে মিঞা কি কোনো তুক্‌তাক্ হাসিল করেছে না কি! না নেহাৎ পাগলামি করছে!

তিনদিন পরে মিঞার কাণ্ড দেখবার কৌতূহলে আমি দুপুরবেলা থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আমার বুকের ভেতরটায় অহেতুক এক দুশ্চিন্তা আনাগোনা করছে। যেন আমারই আজ অগ্নিপরীক্ষা হবে। যদি কোটটা সত্যিসত্যিই নবাবজাদার গায়ে ফিট না করে! কিন্তু মিঞা নীল আর খয়েরি রঙের লুঙ্গি আর একটা ময়লা গোলাপী রঙের গেঞ্জি প'রে নিশ্চিন্ত মনে দরজায় হেলান দিয়ে ব'সে একটি লোকের সঙ্গে পায়রার জাত নিয়ে অবোধ্য খুঁটিনাটির আলোচনায় মশগুল। এ-রকম সময় নবাবজাদা কেন, দুনিয়ার অন্য সব-কিছুর কথাই সে ভুলে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ে ফোর্ড গাড়ি এসে হাজির। আমার উত্তেজনার সীমা নেই। মিঞা নবাবজাদাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আলমারি থেকে হ্যাঙারে ঝোলানো কোটটি আনবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। বিশেষ কোনো ব্যস্ততা নেই। নবাবজাদার ভ্রূ ঈষৎ কুঁচকোনো। চোখে-মুখে সন্দেহের ছাপ সুস্পষ্ট। আয়নার মুখোমুখি তাঁকে দাঁড় করিয়ে আলতো ক'রে কোটটি পরিয়ে দিল। এক অলৌকিক ব্যাপার। প্রায়, প্রায় নিখুঁত কাটিং অ্যান্ড

ফিটিং! কাঁধের পুট, আস্তিন, বগল সব ঠিক। শুধু পিঠে একটু ভাঁজ পড়েছে। দেখে নবাবজাদার চোখ ছানাবড়া। মুখ হাঁ ক'রে নির্বাক হয়ে আয়নার সামনে জ'মে গেলেন। আমিও যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখছি। ওস্তাদ হাফিজ মিঞা নীল চকটা দিয়ে কোটের ওপর বীজগণিতের সংকেতের মতো দু-চারটি ছোট্ট-ছোট্ট হাল্কা দাগ বসিয়ে সে-সব জায়গায় আলপিন গেঁথে দিল। ছেলেকে আদেশ করল কী করতে হবে। নবাবজাদার মুখে যেন কে কুলুপ আট্‌কে দিয়েছে। গাড়ির দরজা খুলে ঢুকতে যাবেন আর কি, ঠিক সেইসময়ে একটু থেমে ওস্তাদ দর্জির দিকে মুখ ঘোরালেন। ঠোঁটের ডান কোণে কয়েক সেকেণ্ড ছোট্ট একটি হাসি ধ'রে রেখে বললেন, 'কামাল্ কামাল্! গজব্, গজব্!'

ঘণ্টা দুয়েক পরে সুন্দর ভাঁজে কোটটি ভালো ক'রে ইস্ত্রি ক'রে সেটিকে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রেখে ছেলের মারফত নবাববাড়ি পাঠিয়ে দিল। কী অসাধারণ কারিগর! এই নিরক্ষর লোকটির বিশেষজ্ঞসুলভ বিদ্যা এবং দক্ষতা দেখে আমিও নবাবজাদার মতো বিস্ময়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

যদিও দর্জিগিরিই হাফিজ মিঞার মুখ্য পেশা ছিল, আসলে তার প্রাণ-মন প'ড়ে থাকত তার দোকানের ছাদে রাখা গেরোবাজ পায়রাগুলোর ওপর। আফিমের নেশার মতোই পায়রা-ওড়ানোর নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। ভোরে কাক ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই মিঞা ছাদে উঠে আসে। এইসময় তার সমস্ত অসুস্থতা, অবসাদ, জড়তা তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে অনেক দূরে চ'লে যায়। আগের দিন সন্ধেবেলার চাটাইয়ের ওপর শোয়া নিস্তেজ বিশীর্ণ লোকটির সঙ্গে সকাল বেলার এ-লোকটির কোনোই মিল নেই। উত্তেজনা-মিশ্রিত এক প্রবল কর্মচাঞ্চল্য ভূতের মতো তার ঘাড়ে চেপে বসে। তাকে দেখা মাত্রই পায়রাগুলো যেন খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। সেকি আনন্দ! সেকি ঠেলাঠেলি! যেন অনেকদিন পরে সন্তানেরা তাদের বাপ-মাকে ফিরে পেয়েছে। মুঠো-মুঠো ধান ছড়িয়ে দিয়ে যেই-না খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া, বাঁধভাঙা নদীর জলের মতো পায়রার দল দানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ ক'টি দানা তার হাতে চ'ড়ে না খেতে পেলে যেন তাদের খাওয়াই শেষ হ'ত না। মনিব যেমন তার পোষা কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, মিঞাও ঠিক তেমনি ক'রে তাদের আদর করে। আঃ কী মর্মস্পর্শী সে-দৃশ্য! এই পাখিগুলোর প্রতি তার মমতার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না।

দানা খাওয়া সারা হলেই নিশানের মতো লাল এক টুকরো কাপড় ডগায় বাঁধা একটি মুলি বাঁশের সাহায্যে পায়রাগুলোকে তাড়িয়ে আকাশে উড়িয়ে দেয়। পক্ষিজগতে এমন-কিছু কি আর আছে যার ডানাতে বে-লাগাম ঘোড়ার মতো প্রাণের উদ্দাম উচ্ছলতার এমন আশ্চর্য বিকাশ দেখা যায়! যে-ডানার প্রত্যেকটি পালক বিদ্যুতে ভরপুর এবং বিদ্যুতের মতোই ত্বরিত যার গতি! যার প্রত্যেকটি রোম চাঞ্চল্য আর উত্তেজনায় ভরা! এই পাখিগুলো প্রথমে উর্ধ্বমুখী হয়ে, সোজা লাইন কেটে হাউইবাজির